ইসলামের দৃষ্টিতে হত্যা, সন্ত্রাস এবং জিহাদ

- খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম, মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

আর অ্যান্ড ডি সেল
র‍্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তর
কুর্মিটোলা, ঢাকা

পরিশিষ্ট

ইসলামের দৃষ্টিতে হত্যা, সন্ত্রাস এবং জিহাদ

খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম
সচিব
সেতু বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

হত্যা

যখন কোনো ব্যক্তি বিধি-বিধানের বাইরে অন্য কোনো ব্যক্তির জীবন নিয়ে নেয় তখন তাকে হত্যা হিসেবে অভিহিত করা হয়। ইসলাম ধর্মে কুরআন ও হাদীসে এ জাতীয় হত্যাকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। আল-কুরআনের সূরা বনী ইসরাইল-এর ৩৩ নম্বর আয়াতে এবং সূরা আন্‘আম-এর ১৫১ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে,

وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ

“আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করো না।”

* সূরা বনী ইসরাইলের ৩১-৩৭ নং আয়াতে এবং সূরা আন‘আমের ১৫১-১৫২ নং আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা দশটি বিষয়কে সরাসরি হারাম ঘোষণা করেছেন। সেগুলোর মধ্যে হত্যা অন্যতম। তাফসিরের কিতাবসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আদম (আ.) থেকে রাসূলুল্লাহ (সা.) পর্যন্ত সমস্ত নবী-রাসূলের বিধানে এই বিষয়গুলো হারাম হিসেবে কার্যকর রাখা হয়েছে। মুফাসসিরগণ বলেছেন,

وذكر في هذه الآيات المحرمات التي أجمعت عليها جميع الشرائع ولم تنسخ قط في ملة

“এই আয়াতগুলোতে যে (দশটি) নিষিদ্ধ বিষয় উল্লেখ করা হলো, সেগুলোর নিষিদ্ধতার ব্যাপারে সকল নবী-রাসূলের (আ.) শরীয়তসমূহ ঐকমত্য পোষণ করে। কোনো শরীয়তেই এ বিষয়গুলোকে রহিত করা হয়নি।” (মুহাম্মদ ইবন আহমাদ আবুল কাসেম, আত-তাসহীল লি-‘উলূমিত তানযীল, লেবানন, বৈরূত, শিরকাতু দারিল আরকাম, ১৪১৬, ১খ., পৃ. ২৭৯)

* হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাস‘উদ (রা.) বলেছেন যে, এই দশটি হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অছিয়ত। তাঁর ভাষায় :

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي عَلَيْهَا خَاتَمُهُ فَلْيَقْرَأْ: قُلْ تَعَالَوْا.... ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অছিয়তের প্রতি দৃষ্টি রাখতে, যে অছিয়তের ওপর তাঁর আনীত রিসালাতের ভিত্তি স্থাপিত; সে যেন পাঠ করে কুল তা‘আলাউ সম্পর্কিত আয়াতসমূহের অছিয়তগুলো (অর্থাৎ সূরা আন‘আম ৬ : ১৫১-১৫৩ আয়াত)।” (ইবন

কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল ‘আযীম, লেবানন, বৈরূত, দারুল কুতুবিল ‘ইলমিয়্যা, ১৪১৯, ৩খ., পৃ.৩২২)

এই অছিয়তের অন্যতম হলো হত্যা করা হারাম অর্থাৎ মানুষ হত্যা করো না। এ দশটি বিষয়ে প্রতিটি মুসলমানের অবশ্যই করণীয় হলো–এসব হারাম কাজ থেকে সর্বদাই মুক্ত থাকা এবং অন্যকেও মুক্ত থাকার বিষয়ে শিক্ষা, জ্ঞান, পরামর্শ ও দাওয়াত দেয়া।

* জীবন ও মৃত্যুর মালিক আল্লাহ তা‘আলা। কুরআনে তিনি তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

সূরা হিজর ২৩ নং আয়াতে তিনি বলেছেন,

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ

“আমিই জীবন দিই, আমিই মৃত্যু ঘটাই এবং আমিই চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।”

* সূরা মুলক-এর ২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন,

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

“যিনি (আল্লাহ) সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন। তোমাদের মধ্যে কে কর্মে উত্তম তা পরীক্ষা করার জন্য।”

এই আয়াত দুটির মাধ্যমে আল্লাহ তা‘আলা সরাসরি ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন যে জীবন ও মৃত্যু দুটো বিষয়ই আল্লাহর অধিকারভুক্ত। এর মধ্যে ব্যক্তির কোনো অধিকার নেই।

* সে কারণে আল্লাহ তা‘আলা যেসব জীব খাওয়ার জন্য হালাল ঘোষণা করেছেন, সেগুলোকে তাঁর নির্ধারিত পদ্ধতিতে যবাই করে খাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। সেসব হালাল জীবজন্তু বা পাখি তাঁর নির্ধারিত পদ্ধতি ব্যতীত অন্যভাবে যবাই করলে তা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। কারণ জীবনের মালিক যেহেতু আল্লাহ তা‘আলা সেহেতু তাঁর অনুমোদনের বাইরে কোনো জীবন হরণ করলে তা হত্যার শামিল। একই কারণে অমুসলিম ব্যক্তি মুসলমানদের জন্য হালাল জীব জন্তুর জীবন হরণ করলে তা আহার করাও মুসলমানদের জন্য হারাম। কারণ, তারা আল্লাহর নির্ধারিত পন্থায় জীবন হরণ করে না।

* মানুষ আল্লাহর সৃষ্টির সেরা জীব। সূরা তীনে ৪ নং আয়াতে তিনি ঘোষণা করেছেন,

لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

“আমি মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠরূপে সৃষ্টি করেছি।” এ থেকে বোঝা যায় আল্লাহ তা‘আলার সেরা সৃষ্টিকে হত্যা করা সর্বাবস্থায়ই হারাম।

* তিনটি কারণে মানুষের জীবননাশ করার জন্য আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন। ‘আবদুল্লাহ ইবন মাস‘উদ (রা.) সূত্রে হাদীস এসেছে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন,

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : الثيّب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة

"যে মুসলিম আল্লাহ এক এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর রাসূল বলে সাক্ষ্য দেয় তার রক্ত হালাল নয়। তবে তিনটি কারণে তা হালাল হয় যদি (১) বিবাহিত হয়ে ব্যভিচার করে। (২) যদি কেউ অন্যায়ভাবে কোনো মানুষকে হত্যা করে এবং (৩) যদি সে মুসলিম সম্প্রদায় ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায়।" (আল-বুখারী, আস-সাহীহ, হা. নং : ৬৮৭৮, মুসলিম, আস-সাহীহ, হা. নং : ১৬৭৬)।

এই তিনটি কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে হলে ইসলামী আদালতের মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণপূর্বক রায় থাকতে হবে। মুরতাদ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার পর তাকে তাওবা করার জন্য নির্ধারিত সময় প্রদান করতে হবে। যদি সে তাওবা করে তা হলে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হবে না।

হত্যাকারীর দুনিয়া ও পরকালের শাস্তি

দুনিয়ার শাস্তি

আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে হত্যার অপরাধে অপরাধী ব্যক্তির জন্য সুস্পষ্টভাবে শাস্তির ব্যবস্থা পবিত্র কুরআনে সূরা বাকারা-এর ১৭৮ ও ১৭৯ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ . وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে নিহত ব্যক্তির বদলায় কিসাস গ্রহণ করার বিধান দেয়া হলো। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ক্রীতদাসের বদলে ক্রীতদাস ও নারীর বদলে নারী, কিন্তু তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সাথে তার দায় আদায় করা বিধেয়। এ তো তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ভার লাঘব ও অনুগ্রহ। তার পরও যে সীমালঙ্ঘন করে তার জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি রয়েছে। হে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ! কিসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পারো।"

কিসাস

এ শব্দটি এসেছে 'কাফ সদ সদ' (ق ص ص) শব্দ থেকে। এর অর্থ সমপরিমাণ বা অনুরূপ। কিসাস বলা হয় সে শাস্তিকে, যা হত্যার বদলে হত্যা বা আঘাতের বদলে আঘাতের সমপরিমাণ হত্যা বা আঘাত করার অনুমোদিত প্রতিবিধান।

* কিসাসের বিধান বিশ্বে মানবতার এক অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত। মানুষের মধ্যে সাম্যের মর্যাদা ও সমতার এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। কারণ, জাহিলী যুগে হত্যার বিচারের ক্ষেত্রে কোনো সমতা ছিল না। রাষ্ট্র সমাজব্যবস্থায় উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরা কোনো হত্যায় জড়িত থাকলে তাদের প্রাণদণ্ড হতো না। সেক্ষেত্রে তারা তাদের দাস/দাসীকে উপস্থাপন করত এবং নিহত পরিবার তাদের মধ্য থেকে যে দাস/দাসীকে পছন্দ করত তার মৃত্যুদণ্ড দেয়া

হতো। পক্ষান্তরে সাধারণ ঘরের কোনো ব্যক্তি উচ্চপদস্থ বা সম্ভ্রান্ত ঘরের কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করলে সেক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশবৃন্দ হত্যাকারীর পরিবার/বংশের দুজন/তিনজন/চারজন এমনকি দশজনকেও ইচ্ছামতো নির্বাচন করে তাদের মৃত্যুদণ্ড দিতে পারত।

* আল্লাহ তা'আলা এ জাতীয় ভারসাম্যহীন, অনৈতিক ও মানবতাবিরোধী বিধান বিলুপ্ত করে কিসাসের বিধান নাযিল করেছেন। মানবসমাজে শান্তি ও সমতা নিশ্চিত করেছেন।

সূরা মায়িদার ৪৫ নং আয়াতে এই কিসাস পদ্ধতি পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে,

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"আমি তাদের জন্য তাতে বিধান দিয়েছিলাম, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং জখমের বদলে অনুরূপ জখম। এরপর কেউ তা ক্ষমা করলে তারই পাপ মোচন হবে। যারা আল্লাহ যা এই (কিসাস) সম্পর্কে অবতীর্ণ করেছেন, তদনুসারে বিধান দেয় না তারা যালিম।"

কোনো ব্যক্তির প্রাণ হরণ শুধুমাত্র কিসাসের মাধ্যমেই গ্রহণের বিষয়, যারা এর ব্যত্যয় করবে তারা যালিম, আল্লাহর বিধানে অবিশ্বাসী এবং বিদ্রোহী (মুফতি মুহাম্মদ শফী' তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন, সৌদি আরব পৃ. ৩৩৩)।

* উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট যে, হত্যা ও মৃত্যুদণ্ড দুটি সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়। হত্যা সম্পূর্ণ হারাম এবং মৃত্যুদণ্ড আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত বিধান, যা সমাজ ও রাষ্ট্রে দুষ্টের শাস্তি বিধানের মাধ্যমে সমাজে শান্তি নিশ্চিত করে।

পরকালের শাস্তি

হত্যাকারী পৃথিবীতে যদি তার হত্যার যথোপযুক্ত শাস্তি গ্রহণ না করে, তওবা না করে বা তার বিচার করা না যায় কিংবা তার হত্যার বিষয়টি গোপন থাকে তাহলে উক্ত হত্যাকারীর জন্য পরকালে মহাশাস্তির ব্যবস্থা পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা আল-ইমরান এর ২১ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

"যারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে, আল্লাহর নবীদের হত্যা করে, মানুষের মধ্যে যারা ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয় তাদের হত্যা করে, তুমি তাদের মর্মন্তুদ শাস্তির সংবাদ দাও।"

সূরা আল-ইমরান এর ২২ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

أُوْلَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ

“এই সব লোক, যাদের কার্যাবলি দুনিয়া ও আখিরাতে নিষ্ফল হবে এবং তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই।”

* সূরা ফুরকানের ৬৩ থেকে ৭৩ নং আয়াতে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দাদের তেরটি গুণের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, যারা এসবের অধিকারী হবে তার কুরআন অনুযায়ী ‘ইবাদুর রহমান বা রহমানের বান্দা হিসেবে বিবেচিত হবে। এই তেরোটি গুণের ৮ম গুণটি হলো,

وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا

“তারা আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না, যে এগুলো করে সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং লাঞ্ছিত অবস্থায় সেখানে স্থায়ী হবে।”

* সূরা আল ইমরানের এবং ফুরকানের শাস্তির আয়াত দুটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ জাতীয় হত্যাকারী জাহান্নামে দীর্ঘস্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে। সেক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি আর উপযুক্ত মানের ঈমানদার থাকে না। তার ঈমান ভোঁতা বা অসম্পূর্ণ হয়ে যায় বলে আয়াত দুটি থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। কারণ, দীর্ঘস্থায়ীভাবে জাহান্নামের অধিবাসী হওয়ার ব্যাপারটি সাধারণত কাফিরদের শাস্তি ভোগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ যেন কাফির-মুশরিকদের কাজ অথবা এ জাতীয় অপরাধ কাফির-মুশরিকদের অনুরূপ শাস্তির উপযুক্ততা সৃষ্টি করে।

* এছাড়াও একজন মুসলিমকে হত্যা করার ক্ষেত্রে কুরআনে বিশেষ বিধান শাস্তির বিষয়ে আল্লাহ তা‘আলা সূরা নিসার এর ৯৩ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন,

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمً

“যে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করবে তার শাস্তি জাহান্নাম। সেখানে সে স্থায়ী হবে। আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লা‘নত করবেন এবং তার জন্য প্রস্তুত রাখবেন মহাশাস্তি।”

* কুরআন হাদীসের এসব বিধান থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, হত্যা শুধু হারাম নয়, সেই সঙ্গে হত্যাকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড এবং যে কেউ হত্যা করে পৃথিবীতে তার তওবা এবং শাস্তি গ্রহণপূর্বক প্রতিবিধান করা না হলে সে লাঞ্ছিত-অপমানিত হয়ে জাহান্নামে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করবে।

সন্ত্রাস (ফিৎনা)

ইসলামের দৃষ্টিতে ফিৎনা বলতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা; গৃহযুদ্ধ, বিশৃঙ্খলা, যুল্‌ম, ধ্বংসযজ্ঞকে বোঝানো হয়েছে এবং কুরআন এই সন্ত্রাসী কার্যক্রম তথা ফিৎনাকে হত্যার চেয়েও গুরুতর ও অগ্রহণযোগ্য অপরাধ হিসেবে সাব্যস্ত করেছে।

কুরআনের সূরা বাকারার ১৯১ নং আয়াতে বলা হয়েছে : وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

"ফিৎনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর।"

সূরা বাকারার ২১৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

"ফিৎনা হত্যা অপেক্ষাও বড় অপরাধ।"

এতে বোঝা যায়, এই সন্ত্রাস বা ফিৎনার বিচার ও শাস্তি হত্যার চেয়েও অনেক কঠোর এবং ক্ষেত্রবিশেষ অনেক বেশি গুরুত্ব বহন করে। ফিৎনার বিচার ও শাস্তির জন্য কুরআন পৃথকভাবে বিধান নাযিল করেছে :

সূরা মায়িদার ৩৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করে বেড়ায়, তাদের জন্য এটাই হলো শাস্তি যে তাদের হত্যা করা হবে। অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে হাত ও পা কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে নির্বাসন দেয়া হবে। এগুলো দুনিয়ার লাঞ্ছনা এবং পরকালে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।"

এই অপরাধ কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণিত হলে সেক্ষেত্রে ইসলামী বিধান অনুসারে যথপোযুক্ত শাস্তি প্রদান ব্যতীত ভিন্নতর কিছু করার সুযোগ নেই।

হত্যা ও সন্ত্রাস (ফিৎনা)-এর পার্থক্য

ইসলামে অপরাধসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত

১. তাযীরাত : সাধারণ অপরাধ, যার দণ্ড বিচারক সামগ্রিক বিবেচনায় নির্ধারণ করেন।

২.কিসাস : যে দণ্ড কুরআন নির্ধারিত এবং এক্ষেত্রে অপরাধের শাস্তি অপরাধ-কর্মের হুবহু সমপর্যায়ের। যেমন, হত্যা করা হলে হত্যাকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড এবং যেভাবে সে হত্যা করেছে [যেমন, যবাই করে বা শাসরোধ করে] ঠিক সেভাবেই তার মৃত্যু [তাকে যবাই করে বা শাসরোধ করে] কার্যকর করা। তবে এক্ষেত্রে ভুক্তভোগীর ওয়ারিশরা সুপারিশ করে শাস্তির পরিমাণ হ্রাস বা ক্ষমা করতে পারে।

৩. হুদুদ : যে দণ্ড কুরআন নির্ধারিত এবং এক্ষেত্রে অপরাধের শাস্তি অপরাধ দমনের দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠার অবলম্বন। এ-সংক্রান্ত অপরাধগুলো হলো (১) চুরি (২) ডাকাতি, সন্ত্রাস [ফিৎনা, ফাসাদ, মুহারাবা] (৩) ব্যভিচার (৪) ব্যভিচারের অপবাদ রটানো (৫) মদ্যপান ইত্যাদি। কুরআনের বিধান অনুসারে এই শ্রেণীর অপরাধগুলো শাস্তির বিধান আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। তাই এ অপরাধ হ্রাস করা বা শিথিল করার অধিকার কারো নেই।

হুদুদের অপরাধ প্রমাণিত হলে কোনো সরকার, শাসনকর্তা বা বিচারক কাউকেই শাস্তি লঘু বা গুরুতর করার কোনো ক্ষমতা দেয়া হয়নি। সব দণ্ডনীয় অপরাধের ক্ষেত্রে ন্যায়ের অনুকূলে সুপারিশ শ্রবণ করা যায়; কিন্তু হুদুদের বিষয়ে সুপারিশ করা ও তা আমলে নেয়া উভয়ই অন্যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) এ ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। হুদুদের শাস্তি সাংঘাতিকভাবে আমলযোগ্য এবং এগুলো প্রয়োগের আইনও অমার্জনীয়। অর্থাৎ কোনো অবস্থাতেই তা পরিবর্তন ও লঘু করা যায় না এবং কেউ ক্ষমা করারও অধিকার লাভ করে না।

হত্যা এবং সন্ত্রাস, হাঙ্গামা ও ধ্বংসযজ্ঞ প্রকারের অপরাধগুলো ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণ্য ও অগ্রহণযোগ্য কর্মকাণ্ড, যা শাস্তি গ্রহণ ও তওবা ব্যতীত ঈমান নষ্ট করে দেয়ার এবং ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে খারিজ করার ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

এগুলোর মধ্যে সন্ত্রাস বা ফিৎনা-ফাসাদকে হত্যা অপেক্ষা এ কারণে গুরুতর অপরাধ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে যে, হত্যার প্রভাব বা প্রতিক্রিয়া দ্বারা সাধারণত ব্যক্তি, পরিবার বা সীমিতভাবে দল ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অন্যদিকে সন্ত্রাস (ফিৎনা) সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যাপক ধ্বংসাত্মক ও নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে। সে কারণে এগুলো থেকে বেঁচে থাকাটাই মুসলমানের আসল করণীয়। যদি কোনো মুমিন ফিৎনার অপরাধে অপরাধী হয় এবং পৃথিবীতে সে উক্ত অপরাধের শাস্তি গ্রহণ না করে থাকে, তওবা না করে থাকে তাহলে তাকে অবশ্যই পরকালে এজন্য জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

এ কারণে প্রতিটি মুসলিমকে এসব অপরাধ থেকে দূরে থাকতে হবে এবং অন্যদেরও এসব থেকে দূরে রাখার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকতে হবে। এটাই মুসলমানের মূল কাজ। বলা যায়, এজন্যই তাদেরকে মুসলমান হিসেবে আবির্ভূত ও নির্বাচিত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

"তোমরাই সৃষ্টির সেরা উম্মত। মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে নির্বাচন করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দিবে, অসৎকাজ নিষেধ করবে এবং আল্লাহতে ঈমান রাখবে।" (সূরা আল ইমরান ৩ : ১১০ আয়াত)

এর অর্থ দাঁড়ায়, তোমাদের কাজ হলো, তোমরা নিজেরা হক, ন্যায় ও সততার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে এবং অন্যকেও হক, ন্যায় ও সততার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে জ্ঞান, বিদ্যা-বুদ্ধি ও শিক্ষার দাওয়াত দেবে। নিজেরা অন্যায়, অবিচার, যুল্‌ম, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে

মুক্ত থাকবে এবং অন্যদেরকেও এসব থেকে মুক্ত থাকতে জ্ঞান, বিদ্যা-বুদ্ধি ও শিক্ষার দাওয়াত দিবে। কুরআনের অসংখ্য আয়াতে মুসলমানদের ব্যক্তিগত, দলগত ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত শাসনকর্তাদের এগুলোই কাজ বলে উল্লেখ করা আছে। সুতরাং একজন মুসলিমের পক্ষে কোনো ফিৎনা (সন্ত্রাসী, ধ্বংসাত্মক, ত্রাস-সৃষ্টি) জাতীয় কোনো কাজ করার সুযোগই নেই।

জিহাদ

জিহাদের মূল হলো 'জাহ্দ'। অর্থ হলো প্রচেষ্টা নেয়া, উদ্যোগী হওয়া, সংগ্রাম করা। ইসলামের পরিভাষায় জিহাদ হলো আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা। অর্থাৎ ইসলাম যে বিষয়গুলো বাস্তবায়নের আদেশ দিয়েছে সেগুলো করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেয়া এবং যেগুলো করার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে সেগুলোর প্রতিরোধ বিষয়ে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নেয়াই হলো জিহাদ।

প্রকারভেদ

জিহাদ চার ভাগে বিভক্ত

১. জিহাদ বিন-নাফস (الجهاد بالنفس : মনের জিহাদ)

২. জিহাদ বিল-ইয়াদ বা কিতাল (الجهاد باليد او القتال : হাতের জিহাদ বা অস্ত্রের মাধ্যমে জিহাদ)

৩. জিহাদ বিল-'ইলম (الجهاد بالعلم : ইলমের জিহাদ, কলমের জিহাদ)

৪. জিহাদ বিল-মাল (الجهاد بالمال : সম্পদের জিহাদ)

১. জিহাদ বিন-নাফস (الجهاد بالنفس)

জিহাদ বিন-নাফসকে 'জিহাদে আকবার' অর্থাৎ 'বড় জিহাদ' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। এই জিহাদ বলতে প্রত্যেক মুসলিমের মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখাকে বোঝানো হয়েছে। বিশেষত হারাম ও নাজায়েয যে বিষয়গুলো অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন এবং অর্থনৈতিকভাবে ধন-সম্পদ, লোভ-লালসা ও ক্ষমতার অধিকারী করে দেয় সেগুলো থেকে নিজেকে বিরত রাখা এবং সেইসঙ্গে আল্লাহ নির্দেশিত ইবাদত ও আল্লাহর পথে সম্পদ ব্যয় সন্তুষ্টচিত্তে সম্পন্ন করার জন্য মনকে বশীভূত রাখাই হলো জিহাদ বিন-নাফস। এ জাতীয় জিহাদকারী আল্লাহর খাঁটি বান্দায় পরিণত হয়। কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে,

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ

"আর তোমরা জিহাদ করো আল্লাহর পথে যেভাবে জিহাদ করা উচিত, তিনি তোমাদের মনোনীত করেছেন।" সূরা হজ্জ : ৭৮ আয়াত

হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক (র.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন যে, 'হাক্কা জিহাদিহি' বলতে নিজ প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনার বিরুদ্ধে জিহাদ করাকে বোঝানো হয়েছে। তিনি বলেছেন,

هو مجاهدة النفس والهوى ، وهو الجهاد الأكبر ، وهو حق الجهاد

"তা হচ্ছে মনের বিরুদ্ধে কঠোর জিহাদ করা ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কঠোর জিহাদ করা। আর এটিই হচ্ছে 'জিহাদ আকবার' এবং এটিই হচ্ছে 'হাক্কাল জিহাদ'।" (আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ আছ-ছা'লাবী, আল-কাশফ ওয়াল বায়ান, লেবানন, বৈরূত, দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরাবী, ১৪২২/২০০২ ৭খ., পৃ. ৩৫ সিরাজুদ্দীন উমার আদ-দিমাশকী, আল-লুবাব ফি-উলূমিল কিতাব, লেবানন, বৈরূত, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যা, ১৪১৯/১৯৯৮ ১৪খ., পৃ.১৫৭)

সুতরাং 'জিহাদ বিন-নাফস' বলতে বোঝায় আল্লাহর নির্দেশিত সৎকাজে নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং অসৎকাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার জন্য নিজের প্রবৃত্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা। জিহাদের প্রথম দিকদর্শন হলো, একজন মুসলিম তার নফস'র ওপর নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে আত্মশুদ্ধি অর্জন করবে; যেমন, মদ, সুদ, ঘুষ খাওয়া, ব্যভিচার, অন্যায়, অবিচার, জুলুম করা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবে, যা জিহাদ বিন-নাফস'র মাধ্যমে অর্জিত হয়। এ প্রসঙ্গে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে,

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

"যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করবে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব।" (সূরা আনকাবুত ২৯ : ৬৯ আয়াত)

২. জিহাদ বিল-ইয়াদ বা কিতাল (الجهاد باليد او القتال)

ইসলামের জন্য অস্ত্র হাতে নেয়া বা প্রয়োগ করা বা যুদ্ধ করাকেই জিহাদ বিল ইয়াদ বা কিতাল নামে আখ্যায়িত করা হয়। তবে কুরআনের ৩৬টি আয়াতে জিহাদের উল্লেখ থাকলেও যুদ্ধের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে মাত্র অল্প কয়েকটি আয়াতে। এ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, মোটা দাগে জিহাদ অর্থ সাধারণ যুদ্ধ নয়, বরং সাধারণ যুদ্ধ জিহাদের একটি মাত্র শাখা। গোত্রে-গোত্রে, দলে-দলে, রাষ্ট্র-রাষ্ট্রে চলা প্রচলিত যুদ্ধের আরবি প্রতিশব্দ হলো 'হারব (حرب)'। এজন্য তেমন কোনো শর্ত নেই। নিজেদের বিচার-বিবেচনায়ই তারা অস্ত্র ধারণ বা যুদ্ধ করে যার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু এই 'হারব' শব্দটি উদ্দিষ্ট জিহাদ অর্থে সাধারণত কুরআন বা হাদীসে ব্যবহার করা হয়নি। কারণ, জিহাদ অর্থাৎ জিহাদ বিল-ইয়াদ বা কিতাল হলো আল্লাহর নির্দেশ এবং এগুলো শর্তযুক্ত। এ প্রসঙ্গে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে,

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের সাথে যুদ্ধ করো; কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীকে ভালোবাসেন না।" (সূরা বাকারা ২ : ১৯০ আয়াত)

১৯১ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কয়েকটি শর্ত উল্লেখ করে শত্রুদের সাথে যুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু ১৯২ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন,

فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“যদি তারা বিরত হয় তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল। অর্থাৎ শত্রুপক্ষ যদি যুদ্ধ পরিত্যাগ করে ন্যায়ের পথে আসে তাহলে তারা ক্ষমার যোগ্য হবে, তখন তাদের ক্ষেত্রে যুদ্ধ প্রযোজ্য হবে না। আল্লাহ কুরআন মাজীদে বলেছেন,

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

“যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদের যারা আক্রান্ত হয়েছে; কারণ, তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের সাহায্য করতে সক্ষম।” (সূরা হাজ্জ ২২ : ৩৯ আয়াত)

সূরা বাকারা’র ১৯১-১৯৪, ২১৬-২১৭ এবং সূরা হাজ্জ’র ৩৯-৪০ নং আয়াতে যুদ্ধ সম্পর্কে সরাসরি আদেশ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ আর তা হলো এই আয়াতগুলোই ইসলামে যুদ্ধ সম্পর্কিত প্রথম আয়াত। এগুলো কার্যকর হয়েছে মুসলমানদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আসার পর। সুনান তিরমিযী, সুনান নাসাঈ, সুনান ইবন মাজা, মুসতাদ্‌রাক আল-হাকিম ইত্যাদি হাদীসগ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ আছে। উপরোক্ত আয়াতগুলোতে জিহাদের আদেশ দেয়ার পূর্বে ৭০টিরও অধিক আয়াতে যুদ্ধকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছিল। (মুফতি মুহাম্মদ শফী’, তাফসীরে মা’আরিফুল কুরআন, সৌদি আরব, পৃ. ৯০৩)

এ থেকে সুস্পষ্টভাবে একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, ‘জিহাদ বিল ইয়াদ বা কিতাল’ তথা ইসলামের জন্য যুদ্ধ করার বিষয়টির সাথে রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের সরাসরি সম্পৃক্ততা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) এর জীবিতাবস্থায় বা পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদীন (রা.)-এর সময়েও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বাইরে কেউ জিহাদ বিল ইয়াদ বা কিতালের আদেশ দিয়েছেন–এমন কোনো নজির নেই। অর্থাৎ ইসলামে জিহাদ বিল ইয়াদ বা কিতালের ক্ষমতা রাষ্ট্র পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষের ওপরই শুধু ন্যস্ত। উল্লেখ্য যে, ইমাম আবু হানীফা (র.), ইমাম শাফি‘ঈ (র.), ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বাল (র.) ইসলামের সর্বজনশ্রদ্ধেয় ও গ্রহণীয় ইমাম হওয়া সত্ত্বেও শাসকবর্গের অন্যায় আক্রোশে জেল খেটেছেন এবং নিগৃহীত হয়েছেন। কিন্তু সে কারণে এই তিনজন শ্রদ্ধেয় ইমাম কখনো রাষ্ট্র বা শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র কোনো জিহাদের আহ্বান জানাননি।

এ থেকেও এটা পরিষ্কার যে, জিহাদ বিল-ইয়াদ বা কিতাল অত্যন্ত শর্তযুক্ত একটি জিহাদ, যা বিশেষ অবস্থায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমতিপ্রাপ্ত বা ঘোষিত হতে হবে। কোনো ব্যক্তি, দল বা অংশ নিজেদের স্বার্থে বা বিচার-বিবেচনায় জিহাদ বিল-ইয়াদ বা কিতাল আহ্বানের অধিকারী নয়। তাহলে তা ফিতনার পর্যায়ে পড়বে। কখনো রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ যদি ফাসেক (সত্যত্যাগী/পাপাচারী) বা কুফরিতে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে তাহলে সেক্ষেত্রে দেশের সর্বোচ্চ আলেমবৃন্দ একত্র হয়ে বিষয়টি বিবেচনা করার অধিকার রাখেন। কোনো ব্যক্তি বা দল এককভাবে কিছু পদক্ষেপ নিতে পারে না।

সূরা তাওবাতে এই বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়েছে ৭৩-১০৬ নং আয়াতগুলোতে। এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের শেষ জিহাদ বিল ইয়াদ বা কিতাল। তিনি নিজেই রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের প্রধান হিসেবে এই যুদ্ধের সিদ্ধান্ত ও ঘোষণা দেন। এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা.) যুদ্ধে যাওয়ার ঘোষণা দেয়া সত্ত্বেও ক‘াব ইবন মালিক (রা.), হিলাল ইবন উমাইয়া (রা.) এবং

মুবা'আ ইবন রাবী'আ (রা.) তাতে অংশ নেননি। ফলে তাদের তিনজনকেই ৫০ দিন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সুহবত থেকে দূরে থাকতে হয়েছিল। এ-থেকে আরো সুস্পষ্ট হয় যে, জিহাদ বিল-ইয়াদ বা কিতালের কর্তৃত্বই শুধু কর্তৃপক্ষের তা নয়, সেইসঙ্গে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে কোনো নাগরিককে তাতে অংশগ্রহণের নির্দেশ প্রদান করলে সেটাও তার জন্য অবশ্য করণীয় হয়ে দাঁড়ায়। অন্যথায় সে আইন ভঙ্গকারী হিসেবে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে শাস্তিপ্রাপ্ত হবে।

সাম্প্রতিক সময়গুলোতে দেখা যায় যে, কিছু কিছু গোষ্ঠী বা ব্যক্তি সূরা তাওবার ৫ নং আয়াতের বিচ্ছিন্ন ও ভুল ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে মুসলিম যুবকদের বিপথগামী ও সন্ত্রাসী হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিচ্ছেন এবং এসব যুবকের জীবন ধ্বংস করে দিচ্ছেন ও ইসলামের সাথে সন্ত্রাসের কলঙ্ক লেপনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। এ বিষয়গুলো থেকে আমাদের সচেতন হতে হবে। কারণ, সূরা তাওবার ১-১৫ নং আয়াতগুলো একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। মক্কার মুশরিকরা নিজেরাই হুদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করে বিশ্বাসঘাতকতা করে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে চুক্তিবদ্ধ বনু খোযা'আ'র ওপর আক্রমণ করে। ফলে সন্ধিচুক্তি বাতিল হয়ে যায়। তাদের এ জাতীয় কার্যাবলির জন্য তাদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি বাতিল করে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়।

২-৪ নং আয়াত তিনটিতে যুদ্ধ শুরুর পূর্বে ঐসব মুশরিককে চার মাসের সময় দেয়া হয় এবং এই চার মাসে তারা শান্তি স্থাপন করলে বা ঈমান গ্রহণ করলে তাদের সাথে কোনো যুদ্ধ হবে না বলেও আয়াতগুলোতে নির্দেশনা দেয়া হয়। ৫ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, চার মাস সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর যেসব কাফির-মুশরিকরা নির্দেশনা মানবে না তাদের সাথে যুদ্ধ করো এবং যুদ্ধের সময় তাদের যেখানে পাও সেখানে হত্যা করো। যুদ্ধের স্বাভাবিক বিধানই এটা যে, যুদ্ধের সময় শত্রুকে হত্যা করা হবে; অন্যথায় শত্রুই ঈমানদার-যোদ্ধাকে হত্যা করবে। তবে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এখানে মক্কার ঐ মুশরিকদের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ (সা.) তথা মুসলমানদের সাথে চুক্তিভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। কিন্তু যারা তাদের চুক্তিতে দৃঢ় ছিল সেসব মুশরিকের বিরুদ্ধে কোনোরূপ ব্যবস্থা নিতে নিষেধ করা হয়েছিল।

৪ নং আয়াতে সুস্পষ্টভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে যে,

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

"তবে যে মুশরিকদের সাথে তোমরা চুক্তিবদ্ধ, এরপর যারা তোমাদের ব্যাপারে কোনো ত্রুটি করেনি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেনি তাদের সাথে কৃত চুক্তিকে তাদের মেয়াদ পর্যন্ত পূর্ণ করো। নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালোবাসেন।"

এ থেকে জিহাদ বিল ইয়াদ বা কিতালের মূলনীতি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ইসলামে যে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা অত্যন্ত সাবধানী পদক্ষেপ ও কঠোর শর্তের অধীন।

এমনকি ৫ নং আয়াতে যে কাফির মুশরিকদের যুদ্ধক্ষেত্রে হত্যার নির্দেশ দেয়া হয়েছে সে আয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, যুদ্ধের সময়েও যদি কোনো প্রতিপক্ষ তাওবা করে তবে তাকে ছেড়ে দাও।

৬ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুশরিকদের কেউ যদি নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দেবে যাতে সে আল্লাহর কালাম শুনতে পায়। শুধু তা-ই নয়, এরপর একটি বিশেষ দায়িত্ব মুসলমানদের ওপর দেয়া হয়েছে, তা হলো, তাকে তার নিরাপদ স্থান পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। এটাই ইসলামের আদেশ। অথচ এসব বিধি-বিধান অবহিত না হয়ে এগুলোর খণ্ডিত ও অপব্যাখ্যার মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থায় ভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে।

এগুলো থেকে মুক্ত থাকা এবং সঠিকভাবে জিহাদ পরিচালনা করা প্রত্যেকটি মুসলিম রাষ্ট্র এবং মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব।

৩. জিহাদ বিল-‘ইলম (الجهاد بالعلم)

জান, মাল, বক্তৃতা, লেখনী ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহর পথে লড়াই করার কাজে নিজের সর্বশক্তি ব্যয় করাকেই সত্যিকারভাবে জিহাদ বিল-‘ইলম বলা হয়।

এ থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, জিহাদের অন্যতম একটি দিক হলো বক্তৃতা ও লেখনী অর্থাৎ দীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারে সর্বাত্মকভাবে নিজের জীবন-সম্পদ দিয়ে প্রচেষ্টা নেয়া। এটাকেই জিহাদ বিল-‘ইলম হিসেবে শনাক্ত করা যায়। আল্লাহ তা‘আলা স্বয়ং কুরআনে উল্লেখ করেছেন,

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

“কাফিরদের আনুগত্য করবেন না এবং এর (কুরআনের) সাহায্যে ওদের সাথে বড় জিহাদে লিপ্ত থাকো।” (সূরা ফুরকান ২৫ : ৫২ আয়াত)

তাফসীরে মা-আরিফুল কুরআনে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুরআনের মাধ্যমে কাফিরদের সাথে বড় জিহাদ করার অর্থ হলো কুরআনের বিধি-বিধান প্রচার করা ও কুরআনের দিকে মানুষকে আহ্বান জানানো। সেটা উদ্বুদ্ধকরণ, বক্তৃতা, লিখন, দাওয়াত তাবলীগ–যেভাবেই হোক এগুলোকে কুরআনই ‘বড় জিহাদ’ হিসেবে ঘোষণা করেছে। (তাফসীরে মা‘রেফুল কুরআন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬৩) এটাই মুসলমানদের ব্যক্তিগত, দলীয় ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় মূল কাজ।

ব্যক্তিগত কাজ হিসেবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

“তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে, তোমাদের কাজ মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দান করা এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকার প্রচেষ্টা নেয়া এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করো।” (সূরা আল-ইমরান ৩ : ১১০ আয়াত)

এ আয়াতটি সমগ্র কুরআনে মুসলমানদের ব্যক্তিগতভাবে দায়-দায়িত্ব পালনের প্রাসঙ্গিক আয়াত। এর মাধ্যমে জিহাদ বিল-‘ইলম অর্থাৎ কুরআনের বাণী অন্যের কাছে পৌঁছানোর কাজটি মুসলমানদের দায়িত্ব-কর্তব্য ও মর্যাদার সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়েছে। “কুনতুম খাইরা উমমাতিন” : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ” অর্থাৎ ‘তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত’ শব্দগুচ্ছ দিয়ে একটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে তা হলো, তোমরা তখনই শ্রেষ্ঠ হবে যখন মানুষের কল্যাণে নিজেদেরকে নিয়োজিত করবে – যদি না করো তাহলে তোমরা শ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। আর মানুষের কল্যাণের অন্যতম শর্ত হলো তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষার প্রচেষ্টা নেয়া। এটা সম্ভব শুধুমাত্র জিহাদ বিল-‘ইলম অর্থাৎ কুরআনের বাণী অন্যের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমে।

মুসলমানদের দলীয় এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতদের জন্য একই কাজ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ জিহাদ বিল-‘ইলম দলীয় ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও অবশ্য করণীয় হিসেবে কুরআনে নির্ধারিত হয়েছে।

দলীয় দায়িত্ব

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকবে যারা মানুষকে সৎকাজের আহ্বান জানাবে এবং অসৎকাজ থেকে ফিরিয়ে রাখাবে, আর তারাই হবে সফলকাম।” (সূরা আল-ইমরান ৩ : ১০৪ আয়াত)

এই আয়াতের বিষয়ে তাফসীরগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই আয়াত দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে একটি দলকে দাওয়াত ও তাবলীগে সর্বদা নিয়োজিত থাকাকে অবশ্য করণীয় দায়িত্ব হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থায় সৎকাজ বা অসৎকাজ যা-ই থাকুক, সর্বাবস্থাতেই এই দলকে তাদের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকতে হবে। এটা আদেশ ও জিহাদ বিল-‘ইলম বাস্তবায়নের যথাযথ পন্থা।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতদের দায়িত্ব

আল্লাহ কুরআনে বলেছেন,

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে (অর্থাৎ রাষ্ট্রক্ষমতা দিলে) তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎকাজ থেকে মানুষকে নিবারণ করবে। আর সব কাজের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারে অর্পিত।” (সূরা হজ্জ ২২ : ৪১ আয়াত)

তাফসীর গ্রন্থগুলোতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই আয়াত মদীনায় হিজরতের পরই নাযিল হয়। তবে তখনো মুসলমানরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু আল্লাহ তা‘আলা এই আয়াতের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা-প্রাপ্ত হলে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতদের জন্য পূর্ব থেকেই দায়িত্ব-কর্তব্য নির্ধারণ করে দেন এবং তা হলো; কুরআন অনুযায়ী সততাপূর্ণ রাষ্ট্রীয় সমাজব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং

অসততা ও অন্যায়-অবিচার দূরীকরণের মাধ্যমে শান্তি স্থাপন। এজন্য তাদেরকে জিহাদ বিল-‘ইলম করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

সুতরাং জিহাদ বিল-‘ইলম-কে দু’ভাগে বিভক্ত করা যায় :

১. প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে দীনের সংরক্ষণ

২. ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচারকে দলিল ও যুক্তির মাধ্যমে মুকাবিলাকরণ

১ ও ২ নং জিহাদ আবার চারটি অংশে বিভক্ত :

ক. ভাষা ও যুক্তির মাধ্যমে

খ. লেখনীর মাধ্যমে

গ. চিন্তা-মননের মাধ্যমে

ঘ. বডি-ল্যাঙ্গুয়েজ (শারীরিক অঙ্গভঙ্গির ভাষা)-এর মাধ্যমে

ঙ. সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমে

এগুলো মুসলমানদের মূল কাজ। মুসলমানকে যে সর্বদা জিহাদে থাকতে বলা হয়েছে তা হলো, জিহাদ বিন-নাফস এবং জিহাদ বিল-‘ইলম। এই দুই জিহাদ পরিত্যাগকারী যেকোনো মুহূর্তে বিপথগামী হতে পারে। বিশেষ করে জিহাদ বিল-‘ইলম থেকে যদি কোনো মুসলমান নিজেকে সরিয়ে রাখে তাহলে তার পক্ষে জিহাদ বিন-নাফসেও সঠিকভাবে অবতীর্ণ হওয়া সম্ভব হবে না। তার চালচলন ও কথাবার্তা ইসলামবিরোধিতায় পরিপূর্ণ থাকবে–তা জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক। সেজন্যই আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে উল্লেখ করেছেন,

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“কথায় কে উত্তম ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা যে আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহ্বান করে, সৎকাজ করে এবং বলে আমি তো মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত।” (সূরা হামীম-সাজদা ৪১ : ৩৩ আয়াত)

এই আয়াত সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলা যায়, মুমিনদের সত্যিকার গুণ হলো :

১. সৎ কথা বলে আল্লাহর দিকে ডাকা ২. সৎকাজ করা এবং ৩. মুসলমান হিসেবে আল্লাহর হুকুম-আহকাম পালন করা।

আল-কুরআনে আল্লাহ তা‘আলা উল্লেখ করেছেন,

قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

“বলো, এটা আমার পথ। যে পথে থেকে আমি আল্লাহর দিকে ডাকি। আমি এবং আমার অনুসারীগণ প্রজ্ঞার ওপর আছি। আল্লাহ পবিত্র এবং আমি শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত নই।” (সূরা ইউসুফ ১২ : ১০৮ আয়াত)

এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এ কথা বলা যায়, এ আয়াত থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, যারা নিজেদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উম্মত হিসেবে দাবি করবে তাদেরকে অবশ্যই নবীওয়ালা কাজ হিসেবে ইসলামের দাওয়াতকে ঘরে ঘরে পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করতে হবে। অর্থাৎ

আয়াতগুলো থেকে এটা সুস্পষ্ট যে উম্মতি মোহাম্মদী হিসেবে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে সর্বাগ্রে জিহাদ বিল-‘ইলমে নিজেদেরকে আন্তকিরভাবে নিয়োজিত রাখতে হবে।

তাই বলা যায়, আল্লাহ তা‘আলা মুসলমানদের প্রতি সুস্পষ্টভাবে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের ব্যাপারে উৎসাহিত করেছেন। কারণ, মুসলমানরা আল্লাহর পথ নির্দেশ ও নিদর্শন সম্পর্কে অবহিত। তাদের কাজ হলো জিহাদ বিল-‘ইলমে নিয়োজিত থেকে মানুষের মধ্যে দীন প্রচার করা–যাতে মানুষ নিজেকে পরিশুদ্ধ করে জান্নাতী হিসেবে জীবন শেষ করতে পারে। তাই সাধ্যানুসারে জিহাদ বিল-‘ইলম তথা দাওয়াতের কাজে প্রতিনিয়ত সচেষ্ট থাকা উচিত। কারণ মুসলমানের জন্য এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ অন্য কোনো বিধান বা পন্থাও নেই। আল্লাহ স্বয়ং কুরআনে মুসলমানদের মুক্তির সে পথ উল্লেখ করেছেন এভাবে,

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

“যারা তওবা করে নিজেকে সংশোধন করবে এবং মানুষের কাছে স্পষ্ট পথনির্দেশ ও নিদর্শনগুলো বর্ণনা করবে তাদের তওবা আমি গ্রহণ করব (অর্থাৎ তাদের ক্ষমা করা হবে); আমি তো অতিশয় তওবা-গ্রহণকারী ও পরম দয়াময়।” (সূরা বাকারা ২ : ১৬০ আয়াত)

৪. জিহাদ বিল-মাল (الجهاد بالمال)

মহান আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি লাভের আশায় শরীয়ত সমর্থিত কোনো কাজে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবা কিরাম (রা.)-এর তরীকায় অর্থ-সম্পদ ব্যয় করাকে জিহাদ বিল-মাল বলে। আল্লাহ তা‘আলা জিহাদ বিল-মাল সম্পর্কে বলেছেন,

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহর রাস্তায় জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করবে; এটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে!” (সূরা সাফ ৬১ : ৮ আয়াত)

আলোচ্য আয়াতে জিহাদ বিল-মালকে অর্থাৎ মালের দ্বারা জিহাদকে নাফস তথা জানের দ্বারা জিহাদের পূর্বে আনা হয়েছে, কারণ জিহাদ বিল-মাল সকলের ওপর অবস্থা বিচারে ফরয। আলোচ্য আয়াতের চাহিদা হলো আল্লাহ তা‘আলার রাস্তায় অর্থ ব্যয় করে নিজেকে জিহাদ বিন-নাফস-এর জন্য প্রস্তুত করা। জিহাদ বিল-‘ইলম ও জিহাদ বিন-নাফস-এর ক্ষেত্রে জিহাদ বিল-মালেরও প্রয়োজন হয়।

ওপরের বিস্তারিত আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, মুসলমানদের ব্যক্তিগত, দলীয় ও রাষ্ট্রীয়ভাবে সর্বদাই জিহাদ বিন-নাফস এবং জিহাদ বিল-‘ইলমে নিয়োজিত থাকতে হবে। এ দু’টি জিহাদ সার্বক্ষণিক ও অবশ্য করণীয়। এগুলো পরিত্যাগের কোনো সুযোগ নেই। পক্ষান্তরে জিহাদ বিল-ইয়াদ বা কিতাল অর্থাৎ যুদ্ধ ও বলপ্রয়োগ ব্যাপারটি রাষ্ট্র কর্তৃক নির্ধারিত। আমাদের জীবনকে সেভাবে পরিচালিত করতে হবে। আর বিত্তবানদের জন্য জিহাদ বিলমালে নিয়োজিত থাকা বিশেষ কর্তব্য। আলাহ তা’য়ালা আমাদের এগুলো বোঝার এবং সে অনুসারে আমল করার তাওফীক দান করুন। **–আমীন ॥**